বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খন্ড ৩১ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২০

খাদ্যনীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

কাজী সাহাবউদ্দিন*
সীবান সাহানা**

১। সরকারি নীতি প্রণয়নে রাজনৈতিক অর্থনীতির ভূমিকা

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সরকারি নীতি প্রণয়নে রাজনৈতিক অর্থনীতির ভূমিকার বিষয়ে গবেষণাধর্মী কাজ খুব কমই হয়েছে। যদিও কৃষিনীতি প্রণয়ন বা নীতি সংস্কার এর পিছনে যে রাজনৈতিক অর্থনীতি কাজ করে, সেটি বিশেণ্ডষণের জন্য কিছু গবেষণাধর্মী কাজ হয়েছে (Abdullah and Shahabuddin, 1997, Ahmed et.al. 2009), খাদ্যনীতি প্রণয়ন বিশেষত খাদ্য মজুদ নীতির ব্যাপারে যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ কাজ করে তাকে ব্যাখ্যা করার মতো বিশেণ্ডষণধর্মী কাজ খুবই বিরল।[১] এ প্রবন্ধটি বাংলাদেশ খাদ্যনীতি প্রণয়নের পেছনে রাজনৈতিক অর্থনীতির ভূমিকাকে বিশেণ্ডষণ করার একটি প্রয়াস। এক্ষেত্রে প্রথমেই সরকারি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক অর্থনীতি কাজ করে তার উলেণ্ডখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরার মাধ্যমে বিষয়টিকে বিশেণ্ডষণ করার চেষ্টা করা হবে।

নীতিমালা প্রণয়নের সময় সরকারকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় এবং পরস্পরবিরোধী নানা বিষয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করতে হয়। নীতি প্রণয়নের সঙ্গে সংশিণ্ডষ্ট যে সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ জড়িত সরকারকে তাদের চাপের সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে সরকারকে তাদের চাপের সামনে নতি স্বীকার করতে হয় এবং তাদের বিভিন্ন প্রস্ড়াবকে নীতিমালার অন্ড়র্ভুক্ত করতে হয়। যদি এধরনের কোনো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী না থাকে বা তাদের একের দাবী অপরের দাবীর বিপরীতমুখে কাজ করে তখন সরকার তার নিজস্ব যুক্তি ও বিবেচনা প্রয়োগের মাধ্যমে জনস্বার্থে নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে (Grindle, ১৯৯১)। কোনো নীতি প্রণয়ন বা সংস্কার প্রস্ড়াবনা যদি অর্থবহ অর্থনৈতিক বিবেচনায় প্রস্তুত করা হয়, তা বাস্ড়বায়িত হতে পারবে না যদি না তা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়। এরকম ক্ষেত্রে সরকার এমন কোনো নীতি বাস্ড়বায়ন করতে বাধ্য হয় যা অর্থনৈতিক বিবেচনায় কম যুক্তিসঙ্গত হলেও সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং একইসাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অন্যতম গুর"ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সাধারণভাবে কৃষকদের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভূমিকা এবং চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে গ্রামীণ দরিদ্র সমাজের অনুপস্থিতি। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ এই জনগোষ্ঠীর অন্ড়র্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানগত দূরত্ব, আভ্যন্ড়রীণ বিচ্ছিন্নতা, মতগত পার্থক্য এবং সর্বোপরী অর্থনৈতিক দুর্বলতা তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে অকার্যকর করে তুলেছে। অপরপক্ষে চাপ সৃষ্টিকারী

---

* প্রফেসরিয়াল ফেলো, বিআইডিএস।
** রিসার্চ এসোসিয়েট, বিআইডিএস।
[১] Chowdhury and Haggblade (2000) কর্তৃক রচিত প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উলেণ্ডখযোগ্য।

গোষ্ঠী হিসেবে শহুরে প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমজীবি গোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র এবং বেসরকারি উদ্যোক্তা দলগতভাবে শক্ত অবস্থানের কারণে সরকারের পক্ষে তাদের মতামতকে উপেক্ষা করা দু:সাধ্য হয়ে পড়ে।

সংস্কার এর প্রশ্নে সামাজিক বিজ্ঞানীদের মতভেদও কৃষি কিংবা অন্যান্য অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু সমালোচক মনে করেন বাজার অর্থনীতি গড়ে উঠেছে নব্য সাম্রাজ্যবাদের (neo-colonialism) ছায়ায় যা কিনা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শোষণের একটি হাতিয়ার মাত্র। এই সমালোচকগণ চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্যকে এবং ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষকে বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালের চীনের বাজার অর্থনীতির দিকে ঝুকে পড়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন, কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের আস্থাকে দূর করতে সক্ষম হয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। অবশ্য বাজার অর্থনীতি বিরোধী যথেষ্ট শক্তিশালী একটি গোষ্ঠী এখনও বিরাজমান; যারা তাদের নিজস্ব মতবাদের আলোকে বাজারমুখী কোনো সংস্কারের বিপক্ষে যুক্তি প্রদান করে থাকে।

যে কোনো নীতিমালা গ্রহণের বা সংস্কারের প্রক্রিয়া একটি জটিল পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হয়। কেননা প্রায়:শ নীতিনির্ধারক এবং প্রয়োগকারীদেরকে নীতিমালার যৌক্তিকতা-সংক্রান্ড় বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ, এমনকি পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিতে দেখা যায়।[১] মাঝে মাঝে সংশিণ্টষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে এই অবস্থার উদ্রেক ঘটে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়গুলোর মাঝে প্রতিযোগিতা এবং আমলাদের ক্ষমতা কুক্ষীগত করার প্রবণতার কারণে রাজনীতিবিদদের সদিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্ড়াবিত বাণিজ্য উদারীকরণ সংক্রান্ড় নীতিমালা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিরোধীতার সম্মুখীন হতে পারে।

অতীতে বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেট বহুলাংশে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে সরকারি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থাদেরও গুর"ত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। সত্তর এবং আশির দশকে কৃষি গবেষণা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও খাদ্য সাহায্যের ক্ষেত্রে দাতাদের উপর নির্ভরশীলতার কারণে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থার মতামতকে গুর"ত্ব সহকারে বিবেচনা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। ফলে নীতিমালা সংস্কার সাপেক্ষে ঋণ প্রদানের শর্ত আরোপের মাধ্যমে দাতা সংস্থাসমূহ (ADB, USAID ও WB) কৃষি ও খাদ্য সংক্রান্ড় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্ড়ার করতে সক্ষম হয়।

দাতাগোষ্ঠীর চাপের বা শর্তের মুখে কোনো নীতি প্রণয়ন করা হলেই যে তা ভুল কিংবা জনস্বার্থবিরোধী হবে সেটা মনে করাও সঠিক নয়। কিন্তু অর্থনৈতিক যুক্তির পরিমাপে সঠিক কোনো নীতিমালাকে অবশ্যই সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। তা নাহলে সেটা দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর হয় না। এক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে, সরকার পরবর্তীকালে নীতিটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে এধরনের নীতি গ্রহণের ফলে সরকার পতনের মতো ঘটনাও ঘটে যেতে পারে ।

[১] নীতি সংস্কারসমূহের বাস্ড়বায়ন কত দ্র"ততার সাথে করা যায় এবং তার ধরন কি হওয়া উচিত, এ ব্যাপারে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

ক্ষমতাসীন সরকারি দল যখনই কোনো কঠিন পদক্ষেপ নিতে চায় তখন ক্ষতিগ্রস্ড় গোষ্ঠী (যে কোনো নীতির ক্ষেত্রের কোনো না কোনো গোষ্ঠী কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ড় হয়, আর একারণেই নীতি প্রণয়ন দুরূহ ব্যাপার) অথবা বিরোধী দলগুলো সরকারি দলকে বেকায়দায় ফেলার জন্য নীতিটি বাস্ড়বায়ন বা সংস্কার প্রক্রিয়া বিলম্বিত অথবা বাতিলকরণের পক্ষে জনমত গঠনে সক্রিয় হয়ে যায়। যদিও এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারই অংশ কিন্তু এর ফলে নীতি গ্রহণ, বাস্ড়বায়ন বা সংস্কার বিষয়ক কোনো কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করাটা সরকারের জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। একারণেই যে কোনো ধরনের নীতি প্রণয়ন ও তা সঠিকভাবে বাস্ড়বায়নের জন্য প্রয়োজন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ন্যূনতম মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে ভোট দানে আকৃষ্ট করার নিমিত্তে অবাস্ড়ব ও অযৌক্তিক প্রতিশ্র"তি প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বস্তুত জনগণকে অর্থনৈতিক বাস্ড়বতার ব্যাপারে সঠিকভাবে অবহিত করা রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

সরকার বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন ও নীতিমালা সংস্কারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ড়দের ক্ষতির পরিমাণকে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে কিছু মাত্রায় সহনীয় করতে পারে। এই লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন ধরনের যে সকল কর্মসূচি নেয়া হয় তার ব্যবস্থাপনাগত ত্র"টিগুলো দূরীকরণের মাধ্যমে এর সুফল সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশি সহজলভ্য করা প্রয়োজন।

নীতি প্রণেতাগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নের পিছনের অর্থনৈতিক বিশেণ্ডষণকে আমলে নেন না কারণ তারা মনে করেন এইসব বিশেণ্ডষণ আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাস্ড়বতার আলোকে নিরূপিত নয়। বিশেণ্ডষকগণ প্রায়শই রাজনৈতিক টানাপোড়েন, সরকারি সংস্থাগুলোর পরস্পর বিরোধী লক্ষ্যসমূহ, সরকারি ও ব্যক্তিখাতের মধ্যস্বত্বভোগী মুনাফা প্রবণতা (rent-seeking behaviour), সমঝোতার সুযোগের সদ্ব্যবহার প্রভৃতির বাস্ড়বতাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন।

রাজনৈতিক অর্থনীতির নিওক্লাসিকাল মতবাদ (neoclassical political economy theory) অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তি মনে করেন কোনো নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করার ফলে তারা লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ড় হবেন তারা ততক্ষণ পর্যন্ড় সেই নীতিমালাকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে যাবেন যতক্ষণ পর্যন্ড় না এটি করার প্রাক্কলিত ব্যয়ের ফলে অর্জিত লাভকে ছাড়িয়ে যাবে। এদের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ কোনো সময়কালে এই নীতি গ্রহণের প্রক্রিয়াকে অধিক প্রভাবিত করতে পারবেন, কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে বেশি রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন হবেন, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে (policymaking process) প্রভাবিত করতে সক্ষম হবেন। কার্যকর ও বাস্ড়বায়নযোগ্য সুপারিশ প্রদানের জন্য বিশেণ্ডষকগণকে এই সকল প্রভাবকরা কিভাবে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় তাদের যথার্থ ভূমিকা পালন করেন তা বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে।

নীতিমালাকে প্রভাবিত করার জন্য বিশেণ্ডষকগণকে অবশ্যই নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার পেছনে যে রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করে তা বুঝতে হবে। তাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, কোনো নীতিমালা বা কর্মসূচি প্রণয়নের এবং বাস্ড়বায়নের সময় নীতি প্রণয়নকারীগণকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক যুক্তির দিকে খেয়াল রাখলেই হয় না, এর সাথে জড়িত রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন বিষয়কেও বিবেচনা করতে হয়। রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা ও অর্থনৈতিক যুক্তির বিচারে উত্তীর্ণ হওয়া, উভয়ই জর"রি ও

গুর"ত্বপূর্ণ। কোনো নীতিমালা প্রণয়নের সময় তা যে রাজনৈতিক পরিবেশে বাস্ড়বায়িত হবে তাকে বিবেচনায় রাখাটা খুবই জর"রি। তা নাহলে সংকীর্ণ অর্থনৈতিক ও কারিগরি যুক্তির আলোকে (narrow technical or analytical sense) সফল হলেও এই ধরনের নীতিমালা শুধুমাত্র অগ্রহণযোগ্যই হবে না, এটা বাস্ড়বায়ন করাও প্রায় দু:সাধ্য হয়ে পড়বে।

রাজনৈতিক অর্থনীতির যুক্তির আলোকে নীতি বিশেণ্ডষণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্ড়রায় হলো নিওক্ল্যাসিকাল অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাহায্যে কিংবা অর্থনৈতিক মডেলের দ্বারা নীতিমালা ব্যাখ্যা করার মতো যে তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক অর্থনৈতিক জ্ঞান প্রয়োজন তা এখনও পরিপূর্ণরূপে গড়ে উঠেনি। কিছু কিছু অর্থনৈতিক মডেলের দ্বারা রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে সমীকরণের মধ্যে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে যদিও জটিলতা এড়ানোর জন্য এসকল ক্ষেত্রে যে সকল পূর্বশর্ত অনুমিত হয় তা বহুলাংশে অবাস্ড়ব। নীতি প্রণয়ন, বিশেণ্ডষণ ও বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অর্থনীতির যুক্তি প্রণয়নের জন্য একটি বাস্ড়বসম্মত পদ্ধতি গড়ে তোলা ও তার গুণগত উৎকর্ষসাধন খুবই অপরিহার্য (Pinstrup-Anderson, 1993)।

২। বাংলাদেশে খাদ্যনীতি সংস্কারের পর্যালোচনা

বাংলাদেশে খাদ্যনীতি সংস্কারের সাথে অর্থনৈতিক উদারীকরণের একটি নিবিড় সংযোগ রয়েছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনের বিশেষত ধান উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ও খাদ্যশস্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নতি নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে সরকার কর্তৃক খাদ্যনীতির পুনর্বিন্যাসের পথটিকে সুগম করে দেয়। সত্তরের দশকে উচ্চফলনশীল ধান ও গমের ব্যবহার শুর"র সাথে খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির যে ধারা সূচিত হয় সার ও সেচযন্ত্রের বাজার উদারীকরণের মাধ্যমে তা ত্বরান্বিত হয়।[৩]

খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি এবং একই সাথে গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে এক ধরনের "বাজার বিপণ্ডব" (marketing revolution) এর সূত্রপাত ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৭২ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ১০ মিলিয়ন টন যা ১৯৯২ সালে ১৮ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়। একই সময় উদ্বৃত্ত বাজারজাতকরণ (marketed surplus) এর পরিমাণ ছয় গুণ বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ার ফলে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। একই সাথে দ্র"ত নগরায়ন এবং গম ও গমজাত দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চালের প্রকৃত মূল্য (real price) হ্রাস পায়।

বাজারে চালের দাম কমে যাওয়ায় এবং একই সাথে রেশনিং চ্যানেলে চালের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে রেশন কার্ড ব্যবহার করে চাল কেনার আগ্রহ কমে যায়। ফলে সরকার PFDS-এর মাধ্যমে চাল বিতরণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ড় নেয়। এই সিদ্ধান্ড় গ্রহণের ফলে সরকার কর্তৃক খাদ্যখাতে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ হ্রাস পায়। ডিসেম্বর ১৯৯১ থেকে আগস্ট ১৯৯৩ সময়কালের মধ্যে সরকার একাধিক সংস্কার প্রস্ড়াব বাস্ড়বায়ন করে যার মধ্যে বিশেষভাবে উলেণ্ডখযোগ্য পলণ্ডী রেশনিং (Rural Rationing) ব্যবস্থার বিলুপ্তি, সরকারিভাবে ধান-চাল সংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস এবং বেসরকারি উদ্যোগে খাদ্যশস্য আমদানির অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে খাদ্যশস্য আমদানি নীতির উদারীকরণ।

---

[৩] Hossain (1996) এবং Ahmed (2000) বাংলাদেশে কৃষিনীতির সংস্কার এবং কৃষি উৎপাদনে এর প্রভাব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।

এইসব সংস্কারসমূহ বাস্ড়বায়নের ফলে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। পলণ্টী রেশনিং ও সংবিধিবদ্ধ রেশনিং (statutory rationing) বিলুপ্তির মাধ্যমে বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতি হয় এবং সার্বিকভাবে ব্যবস্থাপনাগত ব্যয় (operational cost) ও অপচয় (leakage) হ্রাস পায়। এছাড়া খোলা বাজার বিক্রয় (OMS) সহ অন্যান্য বিতরণ ব্যবস্থার আকারও ক্রমশ কমিয়ে আনা হয় কেননা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় (যেমন ১৯৯৮ সালের বন্যা) চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও স্থিতিশীলকরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাত অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। শুধুমাত্র কিছু চ্যানেল যেমন জর"রি অগ্রাধিকার (Essential Priorities) মিলিটারী, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর জন্য রেশন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়। বর্তমানে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বেশিরভাগই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় দুস্থ জনগোষ্ঠীর মাঝে খাদ্য সাহায্য প্রদানে ব্যবহৃত হয়। বস্তুত ২০০১ সাল থেকে বিক্রয়-বহির্ভূত চ্যানেলের (non-monetised) মাধ্যমে PFDS-এর মোট খাদ্যশস্যের দুই-তৃতীয়াংশ বিতরণ করা হয়। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ PFDS-এর ভর্তুকিকৃত বিক্রয় চ্যানেলের (monetised) মাধ্যমে বণ্টিত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী ভর্তুকিকৃত বিক্রয় চ্যানেল থেকে বিক্রয় বহির্ভূত সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য বিতরণের ফলে সার্বিকভাবে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে (Dorosh et. al. 2004)। এছাড়া ১৯৯৪ সালে খাদ্য আমদানি নীতি উদারীকরণের ফলে দেশে মোট খাদ্যশস্য আমদানির সিংহভাগ বেসরকারি খাতে আমদানি করা হয়।[৪]

বিগত তিন দশক ধরে বাংলাদেশে খাদ্য অর্থনীতি বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। এই পরিবর্তনের ধরন এবং ধারা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে (Ahmed et. al. 2000, Dorosh et. al. 2004)। অতীতে খাদ্য ও কৃষি খাতে যে ধরনের সংস্কার সাধিত হয়েছে তার ফলে ভর্তুকির পরিমাণ যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমনিভাবে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা ও বাজার ব্যবস্থার সমন্বয়ের ফলে সার্বিকভাবে দেশে খাদ্য ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজার-বান্ধব (market-friendly) এসকল সংস্কার কৃষিক্ষেত্রে প্রণোদনা সংক্রান্ড় বিভিন্ন বিচ্যুতি (distortions) দূর করবে এবং দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হয় (Ahmed et. al. 2009)।[৫]

কিন্তু বিগত কয়েক বছরের বিভিন্ন ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি মৌলিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ২০০৭-০৮ সালে বিশ্ব বাজারে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব দেশের আভ্যন্ড়রীণ বাজারেও প্রতিফলিত হয়, পরবর্তীতে যা দেশের খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টির বিষয়টিকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়। সারের অপ্রতুল সরবরাহ ও সেচের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি সংকটের ফলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। একই সাথে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা করার প্রবণতা (rent-seeking behaviour) এবং তাদের মিলিত উদ্যোগে কৃত্রিমভাবে মূল্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জনমনে অসন্ড়োষের সৃষ্টি করে। ২০০৮ ও ২০০৯ সালে ধারাবাহিকভাবে আমন ও বোরো ধানের ফলন ভালো হওয়ায় তা চালের বাজারে প্রভাব ফেলতে শুর" করে এবং এর ফলশ্র"তিতে ক্রমশ চালের বাজার স্থিতিশীল হয়ে আসে। ইতিমধ্যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে

[৪] নব্বই দশকের প্রথমার্ধে বেসরকারি খাতে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ মোট আমদানির ৪৬.২ শতাংশ ছিল। পরবর্তীকালে এই আমদানি বিগত দশকের প্রথমার্ধে ৮১.৬ শতাংশে এবং দ্বিতীয়ার্ধে ৮৮.৪ শতাংশে উন্নীত হয়।

[৫] সংস্কার-পরবর্তী সময়ে (post-reform period) খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারতের খাদ্যশস্যের বিশাল মওজুদ এবং আমদানির সুবিধা গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুতপক্ষে, ভারতের খাদ্যশস্যের মজুদ বাংলাদেশে buffer stock হিসেবে কাজ করেছে, বিশেষ করে আভ্যন্ড়রীণ উৎপাদনের ঘাটতি পূরণের মাধ্যমে দেশে সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার ব্যাপারে।

স্থানীয় ও আন্ড়র্জাতিক বাজারে চালের মূল্যের বড় ধরনের পতন ঘটে। দেশে চালের বাম্পার ফলন ও আন্ড়র্জাতিক বাজারে মূল্য পতনের সমন্বিত প্রভাবে ধান কাটার ঠিক আগে (pre-harvest period) সাধারণত যে সময় চালের বাজার চড়া থাকে সেসময়ও চালের মূল্যের দ্র"ত পতন ঘটে। খাদ্য বাজারের এই বিপরীতমুখী এবং অস্বাভাবিক আচরণ নীতিনির্ধারকদের যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় (Murshid et. al. 2009)।

এই সকল ঘটনাক্রম সরকারের কাছে একটি নতুন খাদ্যনীতি প্রণয়নের দাবী রাখে যার প্রধান লক্ষ্য হবে খাদ্য বাজারে মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। বস্তুত খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা জাতীয় খাদ্যনীতি (National Food Policy 2006) এবং Plan of Action (2008-2015) এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই নীতির বাস্ড়বায়ন খুবই কষ্টসাধ্য কেননা এটি করতে হলে উৎপাদক, ভোক্তা, এমনকি ব্যবসায়ীদের পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন স্বার্থসংশিণ্টষ্ট বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং তার সমন্বয় সাধন করতে হবে। এছাড়াও মূল্যস্থিতি বজায় রাখার জন্য, বিশেষ করে দ্রব্যমূল্যের ওঠানামা (fluctuations) একটি নির্দিষ্ট সীমার (well-defined band) মাঝে রাখতে হলে প্রয়োজন একটি বড় আকারের সরকারি মজুদ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা শুধুমাত্র ব্যয়সাপেক্ষই নয়, এর সাথে ব্যবস্থাপনাগত বিভিন্ন সমস্যাও জড়িত রয়েছে। খাদ্য বাজার ব্যবস্থা সাধারণত সুষ্ঠুভাবে কাজ করলেও অনেক সময় বিভিন্ন কারণে মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না।

এটি বলা কঠিন যে, বিগত কয়েক বছরে আভ্যন্ড়রীণ ও বিশ্ববাজারের বিভিন্ন ঘটনার প্রভাবে বাংলাদেশের খাদ্য অর্থনীতি যে অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে গেছে তা একটি সাময়িক ঘটনা না ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। খাদ্য পরিস্থিতির বিশেণ্টষণ এরূপ ধারণাই প্রদান করে যে, ভবিষ্যতে বিশ্ব খাদ্য বাজার ক্রমেই আরও বেশি অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে। খাদ্যশস্য আমদানি ও নির্ভর দেশগুলোর উচিত এই বাস্ড়বতাকে সামনে রেখে নীতি প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়ন করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি উদ্যোগে বৃহৎ আকারের খাদ্য মজুদ রাখা, ধান কাটার মৌসুমে যথেষ্ট পরিমাণে ধান/চাল সংগ্রহ করা ও কৃষিতে ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করার নীতিমালাকে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়। এই বিষয়ের উপর অধিকতর গবেষণা এবং গভীর বিশেণ্টষণের মাধ্যমে ধারণা করা সম্ভব যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন ধরনের নীতি বেশি কার্যকর হবে—অধিক ব্যয়সাপেক্ষ বৃহৎ আকারের সরকারি মজুদ গড়ে তোলা অথবা সরকারি মজুদ ও আমদানি নীতির একটি সমন্বিত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করা (Murshid et. al. 2009)।

বিগত দশকে সরকারের খাদ্যনীতিতে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। খাদ্য এবং কৃষি অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি হস্ড়ক্ষেপ বেড়েছে। তবে এই নীতি কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনবে যখন সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক ও সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩। খাদ্যনীতি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বিগত দুই দশকে, বিশেষ করে নব্বই দশকের প্রথমভাগে খাদ্যনীতিতে যে সংস্কার সাধিত হয়েছে পূর্ববর্তী আলোচনার নিরীখে তা বিশেণ্ডষণ করা যেতে পারে। এই আলোচনাটি আবর্তিত হবে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার পুন:বিন্যাস, বিশেষভাবে রেশনিং ব্যবস্থা সংক্রান্ড় সংস্কারকে কেন্দ্র করে।

আশির দশকের শেষভাগে ও নব্বই দশকের প্রথমভাগে PFDS-এর মাধ্যমে বার্ষিক ২.৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হতো। এই বিশাল পরিমাণ খাদ্যশস্য এবং এর সাথে জড়িত সংগ্রহ ব্যবস্থা ও বিতরণ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে দুর্নীতি ও অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করার (rent seeking) বিস্ড়র সুযোগ-সুবিধা ছিল। PFDS-এর মাধ্যমে এই সময়কালে সর্বোচ্চ ২০০ মিলিয়ন ডলারের সরকারিভাবে সংগৃহীকৃত চাল ও খাদ্যসাহায্য হিসেবে পাওয়া ২৫০ মিলিয়ন ডলারের গম বিতরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় PFDS-এর মাধ্যমে বার্ষিক ২৫০ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ খাদ্য ভর্তুকি প্রদান করে। বাংলাদেশে খাদ্যনীতি সংস্কারের প্রক্রিয়া চূড়ান্ড় পর্যায় লাভ করে ১৯৯২ সালে। সরকারিভাবে খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থার সংস্কারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা গড়ে ওঠে। প্রথম পরিবর্তন ঘটে ১৯৭২ থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে, যে সময় রেশন চ্যানেলের বিস্ড়ার ও সংস্কার সাধিত হয়। দ্বিতীয় বড় পরিবর্তনটি ঘটে ১৯৮১-এর পরবর্তী সময়কালে যখন রেশন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে। উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে ১৯৯২ সালে যখন রেশন ব্যবস্থার পক্ষের শক্তির পরাজয় ঘটে। একই বছর সরকার সর্ববৃহৎ রেশনিং চ্যানেল "পলণ্ডী রেশনিং" এর অবলুপ্তি ঘটায়। একই সাথে বাজারমূল্যের পতনের ফলে শহরাঞ্চলে সংবিধিবদ্ধ রেশনিং (Statutory Rationing) চ্যানেলের মাধ্যমে চাল ক্রয়ের প্রবণতা কমে যায়। উভয় চ্যানেলের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ কমে যাওয়ায় সরকারি খাদ্য গুদামে প্রায় ১ মিলিয়ন টন খাদ্য শস্যের মজুদ জমে ওঠে, আপাতদৃষ্টিতে যার বিতরণ ব্যবস্থার কোনো প্রক্রিয়া নজরে আসছিল না। দীর্ঘদিন গুদামজাত থাকার ফলে খাদ্যশস্যের মানেরও অবনতি ঘটছিল। এই অবস্থা সংস্কারপন্থীদের বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছিল এবং সংস্কার-বিরোধীদের সরকারি পদক্ষেপের বির"দ্ধে অবস্থান নেওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছিল। ক্রমে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়ে আসে এবং নানামুখী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সরকার PFDS-এর আকার হ্রাস করতে সক্ষম হয় (Chowdhury & Haggblade 2000)।

সরকারি খাদ্য বিতরণ পরিমাণ কমানো ছিল সরকারের একটি উলেণ্ডখযোগ্য সংস্কার পদক্ষেপ যা ছিল সংস্কারপন্থী ও সংস্কার বিরোধী উভয় দলের চাপ-প্রতিচাপ, এবং কৌশল-প্রতিকৌশলের একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় অন্ড়র্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন শক্তিশালী মহল যাদের স্বার্থ এই বিতরণ ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিল। এদের মধ্যে রয়েছে তিনটি সরকার, ছয়টি খাদ্যদাতা প্রতিষ্ঠান (food aid donors), লক্ষ রেশনভোক্তা, এবং সরকারকে চাল সরবরাহকারী উলেণ্ডখযোগ্য সংখ্যক মিলার। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ছিল একই সাথে জটিল ও কৌতুহলোদ্দীপক কারণ এর মধ্যে নিহিত আছে আদর্শবাদ ও সুযোগসন্ধানী মানসিকতা থেকে শুর" করে শর্ত ও স্বার্থের মতো বিপরীতমুখী বিষয়ের দ্বন্দ্ব, যা সুনিশ্চিতভাবে পরবর্তীকালে বাংলাদেশে খাদ্যনীতি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশেণ্ডষণে সহায়ক হবে।

৩.১। সংস্কারের পক্ষের ও বিপক্ষের কুশীলবেরা (The Actors in the Drama: Reformers and Resisters of Change)

বাংলাদেশে খাদ্যনীতি পরিবর্তনের পটপরিক্রমায় অন্যতম প্রধান কুশীলব হলো স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দল ও তাদের আদর্শগত পার্থক্য যা কিনা সমাজতন্ত্র থেকে শুর করে বাজারমুখী অর্থনীতি পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত। এমনকি একই সরকারের মধ্যেও নেতা ও আমলাদের বিভিন্ন সময়ে পরস্পর বিরোধী অবস্থান নিতে দেখা গেছে।[৬] ১৯৮০ পরবর্তী সময়ে খাদ্য ভর্তুকি কমানোর সমর্থনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠে। এরশাদ সরকারের সময় (১৯৮২-৯০) সংসদ সদস্যদের পলণ্টী রেশনিং চ্যানেলের ডিলার নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করার ফলে খাদ্যনীতি বাস্ড়বায়ন সংক্রান্ড় বিভিন্ন কর্মসূচির দায়িত্ব জেলা খাদ্য কমিটির পরিবর্তে সরাসরি সংসদ সদস্যদের হাতে চলে আসে। রেশনের মাধ্যমে বিতরণকৃত খাদ্য ভর্তুকির দীর্ঘদিনের সুবিধাভোগকারী হিসেবে সামরিক বাহিনীও খাদ্যনীতি পরিকল্পনা ব্যবস্থার একটি অংশ ছিল।[৭]

এছাড়া খাদ্য সাহায্য দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় ভূমিকা রাখে। এদের মধ্যে ইউএসএআইডি (USAID), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (World Food Programme), কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং অস্ট্রেলিয়ার নাম বিশেষভাবে উলেণ্টখযোগ্য। সর্ববৃহৎ খাদ্য সাহায্য দাতা হিসেবে USAID "Title III Food-aid Agreement (1978-79)" বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী বিশেণ্টষণধর্মী গবেষণা ও সরাসরি শর্ত প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের খাদ্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নে উলেণ্টখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বব্যাংকও বাংলাদেশের খাদ্যনীতি প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এছাড়া বিশ্বব্যাংক সার্বিকভাবে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার প্রস্ড়াবকে প্রভাবান্বিত করেছে যা পরবর্তীতে খাদ্যনীতিকে প্রভাবিত করেছে। USAID-এর মতো বিশ্বব্যাংকও খাদ্যনীতির উপর বিশেণ্টষণধর্মী গবেষণায় সহায়তা করেছে।

রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে শহরাঞ্চলে ৩০ লক্ষ ভোক্তা ও গ্রামাঞ্চলে ৫০ লক্ষ ভোক্তা খাদ্য ভর্তুকি লাভ করে আসছিল। যদিও সংখ্যাগত ভাবে গ্রামাঞ্চলে রেশন ভোক্তার সংখ্যা শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি ছিল কিন্তু ভৌগোলিক ভাবে তাদের বিচ্ছিন্নতা সাংগঠনিকভাবে তাদের দুর্বল করে তুলেছিল। রেশন ডিলারেরাও Dealers Association গঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে সমর্থ হয়েছিল। অপরপক্ষে সংখ্যায় কম হলেও সরকারকে চাল সরবরাহকারী মিলারেরা প্রভাব বিস্ড়ারে সক্ষম একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এছাড়াও খাদ্য অধিদপ্তর ও সরকারি খাদ্য বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত অন্যান্য মন্ত্রণালয়সমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বার্থও PFDS-এর সাথে জড়িত ছিল।

৩.২। খাদ্যনীতি সংস্কারের ক্রমবিকাশ (Evolution of Food Policy Reforms)

[৬] চালের সংগ্রহ-মূল্য (procurement price) নিরূপণের ব্যাপারে কৃষি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে প্রায়শ পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিতে দেখা গেছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য ছিল কৃষকের জন্য প্রণোদনামূলক উচ্চমূল্য নির্ধারণ করা, অন্যদিকে খাদ্য মন্ত্রণালয় ভোক্তাদের স্বার্থে সংগ্রহ-মূল্য তুলনামূলকভাবে নিম্ন পর্যায়ে রাখার পক্ষে ছিল।

[৭] যে সকল সরকার খাদ্যনীতি সংস্কারের পক্ষে ছিল তারাও Essential Priority ration channel বিলুপ্তির ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেছে যাতে সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হতে না হয়।

১৯৭২ সাল থেকে খাদ্যনীতি সংস্কারের জন্য নেয়া উলেণ্ঢখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা সারণি-১ দেয়া হল। আবর্তনের ধারাবাহিকতায় টেবিলে উপস্থাপিত ঘটনাসমূহকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করা যায়- সমস্যার উপলব্ধি, সমাধানের পথ খোঁজা এবং সংস্কার সাধন (Ali et al., 2008)। সমস্যার প্রথম উপলব্ধি ঘটে যখন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার রেশন ব্যবস্থার প্রসারণের মাধ্যমে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ সাধন করে। সত্তর দশকের প্রথম ভাগে রেশনিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচুর চাল বিতরণ করা হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে দাতা সংস্থাগুলো এই ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ অনুধাবন করে এবং রেশন এর পরিবর্তনে দরিদ্রবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ করার পক্ষে মতামত প্রদান করে।[৮]

সারণি ১

খাদ্যনীতি সংস্কারের পদক্ষেপসমূহের ক্রমধারা

সাল	নীতি পরিবর্তন
খাদ্যনীতির উলেণ্ঢখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ (Long waves in food policy reforms)	
১৯৭২-৭৪	শহরাঞ্চলের রেশন চ্যানেলসমূহের ব্যাপক বিস্ড়ার ঘটে
১৯৭৪	"কাজের বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচির শুর্ হয়
১৯৭৫	"ভালনারেবল গ্র্প ফিডিং" (VGF) কর্মসূচির শুর্ হয়
১৯৭৮	রেশন চ্যানেলের ভর্তুকি কমানোর জন্য পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ প্রদান করে
১৯৮১	গণ আইন ৪৮০ এর মাধ্যমে রেশন মূল্যকে সংগ্রহ মূল্যের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে রেশন চ্যানেলের ভর্তুকি হ্রাসের প্রক্রিয়া শুর্ হয়।
১৯৮৩	পলণ্ঢী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (Rural Maintenance Program) শুর্ হয়।
১৯৮৮	গ্রামাঞ্চলে আটা চাকীর বিতরণ শুর্ হয়
১৯৮৯	মডিফাইড রেশনিং চ্যানেলের পরিবর্তে পলণ্ঢী রেশনিং চ্যানেল শুর্ হয়।
১৯৮৯	দেশের অভ্যন্ড়রে খাদ্যশস্যের চলাচলে স্থগিতাদেশ বাতিল করা হয়।
১৯৯১	ডিসেম্বর মাসে পলণ্ঢী রেশনিং ব্যবস্থা স্থগিত করা হয়।
খাদ্যনীতির ক্ষুদ্র পরিবর্তনসমূহ (Short bursts in food policy reforms)	
১৯৯২	মে মাসে পলণ্ঢী রেশনিং চ্যানেলটি বিলুপ্ত করা হয়।
১৯৯২	জুলাই মাসে প্রথম ব্যক্তিখাতে গম আমদানির অনুমতি প্রদান করা হয়।
১৯৯২	অক্টোবর মাসে খাদ্যশস্যে ঋণ প্রদানের স্থগিতাদেশ বাতিল করা হয়।
১৯৯২	নভেম্বর মাসে সরকারিভাবে ধান-চালের সংগ্রহ স্থগিত করা হয়।
১৯৯২	মিলগেট চুক্তি বাতিল করা হয়।
১৯৯২	খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল কমানোর প্রস্ড়াব দেয়া হয়।
১৯৯২	সংবিধিবদ্ধ রেশনিং চ্যানেলের মাধ্যমে চালের বিতরণ বন্ধ করে দেয়া হয়।
১৯৯৩	জুলাই মাসে প্রথম ব্যক্তিখাতে চাল আমদানি করার অনুমতি প্রদান করা হয়।
১৯৯৩	সংবিধিবদ্ধ রেশনিং চ্যানেলের মাধ্যমে গমের বিতরণ বন্ধ করে দেয়া হয়।
১৯৯৩	শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচি শুর্ হয়।
২০০২	শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়া হয়।
২০০২	সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি শুর্ হয়।

উৎস: Chowdhury and Haggblade (2000) এবং Ali et al. (2008)।

[৮] প্রকৃতপক্ষে এই উপলব্ধি খাদ্যনীতি সংস্কারে এক নতুন মাত্রা যোগ করে, যা পরবর্তীকালে কাজের-বিনিময়ে-খাদ্য (FFW) এবং Vulnerable Group Development (VGD)-এর মতো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনে সহায়তা করে।

১৯৭৮ সাল থেকে রেশন চ্যানেলে ভর্তুকি কমানোর জন্য পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করে আসছিল; এরই ধারাবাহিকতায় রেশন মূল্যকে সংগ্রহ মূল্যের সাথে সংযুক্ত করার একটি পদক্ষেপ নেয়া হয় যার ফলে এই ব্যবস্থা থেকে অতিরিক্ত মুনাফা করার সুযোগ কমে যায় এবং ব্যবস্থাটি ভোক্তাদের কাছে ক্রমেই অনাকর্ষণীয় হয়ে পরে। এই সকল সংস্কারের সূত্র ধরে পরবর্তীতে "মডিফাইড" (modified) রেশনিং ব্যবস্থার" অবলুপ্তি ঘটে এবং পলণ্টী রেশনিং ও পলণ্টী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির সূত্রপাত হয়। কিন্তু দ্র ুতই প্রমাণিত হয় যে পলণ্টী রেশনিং ব্যবস্থাটিও একটি অকার্যকর ও ব্যয়বহুল ব্যবস্থা।

এই সকল অভিজ্ঞতা থেকে সরকার বুঝতে সমর্থ হয় যে খাদ্যনীতি পরিবর্তনের সময় এসে গেছে এবং এর ফলশ্র ুতিতে নব্বই দশকের প্রথমভাগে বেশ কয়েকটি সংস্কার পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উলেণ্টখযোগ্য হলো রেশন ব্যবস্থার অবসান, ব্যক্তিখাতের আমদানির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া এবং সরকারি খাদশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম স্থগিতকরণ। এসকল পদক্ষেপ সাদরে গৃহীত হলেও এর ফলে সরকারি গুদামে খাদ্যশস্যের একটি বিশাল মজুদ গড়ে ওঠে। ফলে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মজুদকৃত খাদ্যশস্য বিতরণের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। এই চ্যালেঞ্জটি পরবর্তীতে সরকারের সামনে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নতুন ধরনের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- কাজের বিনিময়ে খাদ্যসহ অন্যান্য অভিনব কর্মসূচি গ্রহণের সুযোগ করে দেয়।

৩.৩। নীতি সংস্কারের ক্রমধারা (Sequencing of Policy Reforms)

খাদ্যনীতি সংস্কারের ইতিহাসে বড় কিছু পরিবর্তনের পাশাপাশি অনেক ক্ষুদ্র পরিবর্তনও ঘটেছে। বৃহৎ পরিবর্তনসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল রেশন ব্যবস্থার অবলুপ্তি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যা ছিল খাদ্য বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। স্বাধীনতার পর থেকেই সরকার রেশন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন ও সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সাল পর্যন্ড় রেশন চ্যানেলের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাগত ও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যার পিছনে আদর্শবাদী ও মুনাফা সন্ধানী উভয় দলের স্বার্থই জড়িত ছিল। অপরপক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয় খাদ্য সাহায্য দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে একটি জোট গড়ে তোলে যারা মনে করত যে রেশন চ্যানেলের পুরোটিই দুর্নীতিগ্রস্ড় এবং অত্যন্ড় ব্যয়বহুল একটি বিতরণ ব্যবস্থা। এই জোট ১৯৮১ সাল থেকে শুর ু করে ধীরে ধীরে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে রেশন চ্যানেলের ভর্তুকি হ্রাসের চেষ্টা করে আসছিল। যদিও উভয় পক্ষই রেশন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারে একমত ছিল কিন্তু প্রথম দলের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবস্থাটির ত্র ুটিসমূহ দূরীকরণের মাধ্যমে এর সংস্কার সাধন এবং দ্বিতীয় দলের উদ্দেশ্য ছিল ভর্তুকি হ্রাসকরণের মাধ্যমে রেশন ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটানো।

রেশন ব্যবস্থার প্রাথমিক সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল এর সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনাগত উন্নতি সাধন। এই সংস্কার কার্যক্রম শুর ু হয় স্বাধীনতা পরবর্তী দুর্যোগপূর্ণ সময়ে, একটি সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় যাদের লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক সবক্ষেত্রেই সরকারি ভূমিকার সম্প্রসারণ, যার অন্যতম ছিল খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় শহরাঞ্চলে "সংবিধিবদ্ধ রেশনিং চ্যানেল" (statutory rationing channel) বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং সার্বিকভাবে রেশন ব্যবস্থার বরাদ্দ প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। একই সাথে বিভিন্ন পেশাজীবি

গোষ্ঠীকে রেশন ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য নতুন নতুন রেশন চ্যানেল চালু হয়। রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও অপচয়ের ব্যাপক বিস্ড়ার লক্ষ করে ১৯৭৪ সালের এপ্রিল-মে মাসে সামরিক বাহিনীকে পুলিশ ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সহায়তায় নিযুক্ত করা হয়। এই অভিযানের মাধ্যমে ঘরে ঘরে তলণ্ডাশী করে ভুয়া রেশনকার্ড খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। পরবর্তীতে ৭৪-এর শেষদিকে এবং ৭৫-এর প্রথমভাগে সরকার আরও একটি অভিযান চালায়। এই সকল অভিযানের মাধ্যমে প্রায় ১০ লক্ষ ভূয়া রেশনকার্ড ধরা পড়ে। কিন্তু এরপরেও রেশন ব্যবস্থার অপচয় ও দুর্নীতি বিরাজমান থাকে (Chowdhury and Haggblade, 2000)।

আশির দশকের প্রথম ও মধ্যভাগে রেশন ব্যবস্থার বিভিন্ন সংস্কার ঘটলে এসময়ের বিভিন্ন সমীক্ষায় রেশনিং চ্যানেলের বিশেষত সংবিধিবদ্ধ ও মডিফাইড রেশনিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচুর অপচয়ের ও দুর্নীতির বর্ণনা পাওয়া যায়। এসকল গবেষণায় মডিফাইড রেশনিং চ্যানেলের (একমাত্র রেশন চ্যানেল যার দ্বারা পলণ্ডী অঞ্চলের দরিদ্র জনগণ রেশন সেবা লাভ করত) বিভিন্ন অনিয়ম ও খাদ্যের নিম্ন পুষ্টিমানেরও উলেণ্ডখ দেখা যায়। পরবর্তীকালে ১৯৮৯ সালের দিকে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে এসকল অনিয়ম ও দুর্নীতির বির"দ্ধে পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়। মডিফাইড রেশনিং চ্যানেলের অবলুপ্তি ঘটে ও "পলণ্ডী রেশনিং ব্যবস্থা" তার স্থান দখল করে।[১] এই পরিবর্তনটিকে যদিও রেশন ব্যবস্থার সংস্কারের অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ বলে উলেণ্ডখ করা হয় কিন্তু কার্যত এর ফলে রেশন ব্যবস্থার তেমন কোনো উন্নয়ন ঘটেনি। উপরন্তু মডিফাইড চ্যানেলের অপচয়ের পরিমাণ যা কিনা ৫০ শতাংশেরও বেশি ছিল, পলণ্ডী রেশনিং এর ক্ষেত্রে তা আরও বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় (Ahmed 1993, BRAC 1991)। এছাড়া রাজনৈতিকভাবে রেশন ডিলারদের বাছাই ও নিয়োগ রেশন ব্যবস্থার দুর্নীতির পথকে আরও সুগম করে তোলে।

১৯৯১ সালে এরশাদ সরকারের পতনের পর রেশন ব্যবস্থার আরও একটি বড় সংস্কার সাধিত হয়। নব নির্বাচিত খালেদা জিয়া সরকার ১৯৯১-এর ডিসেম্বরে "পলণ্ডী রেশনিং" চ্যানেলটি সাময়িকভাবে স্থগিত করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালের মে মাসে সরকার পলণ্ডী রেশনিং চ্যানেলটির সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটায়। ধারণা করা হয় যে, সরকারের এ পদক্ষেপের পিছনে পূর্বে উলেণ্ডখিত দুটি সমীক্ষা যাতে উলেণ্ডখ করা হয়েছিল যে পলণ্ডী রেশনিং চ্যানেলের ৭০ শতাংশই অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে না তা একটি গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল (BRAC 1991, Ahmed 1993)। এছাড়া এই সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়নের ফলে সরকার বার্ষিক ৬ কোটি ডলার খাদ্য ভর্তুকি হ্রাস করতে সক্ষম হয় যার দ্বারা প্রধানত উপকৃত হত মুনাফা ভোগকারী রেশন ডিলারেরা, খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং সংসদ সদস্যরা (Ahmed 1993)। পলণ্ডী রেশনিং চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংসদ সদস্যদের হাত থেকে "রেশন ডিলার" নিয়োগের ক্ষমতা চলে যায় যা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় করেছিল। এর ফলে যে রাজনৈতিক উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রশমিত করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে সরকার "Working Group on Targeted Food Intervention" নামে একটি কমিটি গঠন করে যাদের কাজ ছিল পলণ্ডী রেশন ব্যবস্থার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা খুঁজে বের করা। এই কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত

[১] পলণ্ডী রেশনিং ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। এই পরিবর্তনসমূহের অন্যতম জেলা খাদ্য কমিটির পরিবর্তে স্থানীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক ডিলার নির্বাচন করা।

রিপোর্টে বলা হয় যে, পূর্ববর্তী সবগুলো রেশন চ্যানেলই অত্যন্ড় ব্যয়বহুল ও ত্রুটিপূর্ণ এবং অতিমাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ড় হয়ে পড়েছিল এবং রেশন ব্যবস্থার পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আরও কার্যকরভাবে সাহায্য করা সম্ভব (WGTFI 1994)। Working Group কর্তৃক প্রদত্ত এই রিপোর্টের মাধ্যমে রেশন ব্যবস্থার বিলুপ্তি নিয়ে সকল বিতর্কের অবসান ঘটে।

প্রায় একই সময়ে খাদ্যনীতিতে আরও একটি বড় পরিবর্তন ঘটে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে শহরাঞ্চলে রেশন এর ভর্তুকি কমানোর ফলে এ থেকে মুনাফা করা এবং খাদ্য সংগ্রহ করার প্রবণতা বিপুলভাবে হ্রাস পায়। মুনাফাকারী ও রেশন ভোক্তা উভয় দলের আগ্রহ কমে যাওয়ায় ধীরে ধীরে শহরাঞ্চলেও রেশন ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

রেশন ব্যবস্থার ভর্তুকি কমানোর জন্য দাতা সংস্থাগুলো এবং সরকার মিলিতভাবে একটি সহজ ও কৌশলী পন্থা অবলম্বন করেছিল। এই কৌশল অনুযায়ী রেশন মূল্যকে (ration offtake price) সরকারি সংগ্রহ মূল্যের (procurement price) সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়।[১৮] USAID এবং অন্যান্য দাতা সংস্থাগুলো কর্তৃক আরোপিত এই শর্তের মাধ্যমে সরকারকে বাধ্য হয় ভোক্তা কিংবা উৎপাদক যে কোনো একটি গোষ্ঠীকে ভর্তুকি বা সরকারি সাহায্য প্রদান করা। খাদ্য সাহায্য (food aid) লাভের জন্য আরোপিত এই শর্তটি ছিল প্রকৃতপক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশজ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রদত্ত প্রণোদনা খাদ্য ভর্তুকি হ্রাসের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল। খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় খোলা বাজারে খাদ্যের মূল্য এমনিতেই কমে আসছিল।[১৯] রেশন চ্যানেলে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং একই সাথে খোলা বাজারে খাদ্য মূল্যের পতন, ভোক্তাদের কাছে রেশন চ্যানেলের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করাকে অনাকর্ষণীয় করে তুলেছিল। এর ফলে রেশন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হলেও অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সরকারকে ভোক্তাদের পক্ষ থেকে খুব কম প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে (Chowdhury and Haggblade, 2000)।

ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে গম এবং ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে চাল আমদানি করার অনুমতি প্রদানের ফলে "Large Employers" চ্যানেল ও "Flour Millers" চ্যানেল তাদের প্রয়োজনীয়তা হারায়। এই পরিক্রমায় ১৯৯২ সালের মে মাসে পলণ্টী রেশনিং চ্যানেলের বিলুপ্তির মাধ্যমে রেশন ব্যবস্থার কফিনে সর্বশেষ পেরেকটি ঠোকা হয়ে যায়, যে ব্যবস্থাটি বিগত ৫০ বছর ধরে সম্প্রসারিত হয়ে আসছিল। ১৯৯২ সালের পরবর্তীতে শুধুমাত্র পুলিশ, আনসার ও সামরিক বাহিনীর জন্য স্বল্প পরিসরে রেশন ব্যবস্থা অবশিষ্ট থাকে।

পলণ্টী রেশনিং ব্যবস্থার অবলুপ্তির ফলে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাটি সাময়িকভাবে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। সর্ববৃহৎ এই রেশনিং চ্যানেলের মাধ্যমে বার্ষিক ৫ লক্ষ টন চাল বিতরণ করা হত যা ছিল

---

[১৮] সরকারের সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে রেশন মূল্যের বৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে রেশন ব্যবস্থায় ভর্তুকি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

[১৯] ষাটের দশকের শেষে এবং সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে কৃষি গবেষণা এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে প্রভূত সরকারি বিনিয়োগ করা হয়, যা পরবর্তীতে কৃষি উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিত করে। উপরন্তু কৃষি উৎপাদনের উপকরণ (যেমন সেচ, সার এবং কীটনাশক দ্রব্য) বাজার ব্যাবস্থার সংস্কারের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন, বিশেষ করে বোরো মৌসুমে ধানের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

PFDS-এর মাধ্যমে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের অর্ধেকের বেশি। এই চ্যানেলের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের বিতরণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরকারি খাদ্য গুদামে প্রচুর চালের মজুদ গড়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে মজুদকৃত অবস্থায় থাকার ফলে চালের মানেরও অবনতি ঘটতে থাকে। এরূপ পরিস্থিতি সরকারকে চাল বিতরণের জন্য বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য করে তোলে। বিকল্প পথ হিসেবে সরকার "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচির আওতায় সে বছর গমের পরিবর্তে মজুরি হিসেবে চাল প্রদানের জন্য দাতা সংস্থাগুলোকে অনুরোধ করে। এই বিকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার স্বল্পমেয়াদে সমস্যা সমাধানে সক্ষম হলেও দীর্ঘমেয়াদে সমস্যা সমাধানের উপায় ছিল সরকারিভাবে ধান-চালের সংগ্রহ কমিয়ে দেয়া।

১৯৯২ সালের নভেম্বরে সরকার ধান-চালের সংগ্রহ স্থগিত করে দেয় যাতে করে সংগ্রহ ও বিতরণের মাঝে একটি সাম্যাবস্থা (balance) বজায় থাকে। এই সংস্কারটিকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় মিলারদের কাছ থেকে চাল কেনার চুক্তি (millgate contracting) বাতিল করে দেয়। এই চুক্তির মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত কতিপয় ডিলারদের কাছ থেকে বাজার মূল্যের থেকে উচ্চমূল্যে চাল সংগ্রহ করত। মিলাররা বাজারমূল্যের চেয়ে সরকারের কাছে বেশি মূল্যে চাল বিক্রয় করার মাধ্যমে অধিক মুনাফা করতে পারত। অধিক মুনাফা করার এই সুযোগ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির মধ্যে দুর্নীতির সৃষ্টি করেছিল। এই সমস্যা দূরীকরণে সরকার সংগ্রহ ব্যবস্থার কিছু ব্যবস্থাপনাগত সংস্কার সাধন করে। এর মধ্যে সংগ্রহকৃত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও মুক্ত টেন্ডারের (open tender) মাধ্যমে বাজার দরে চাল সংগ্রহ করা অন্যতম।

একইসময়ে সরকার তার বাণিজ্য উদারীকরণ নীতি অনুসরণ করে খাদ্য বাজারে সরকারের ভূমিকা হ্রাসের পাশাপাশি ব্যক্তিখাতে খাদ্য আমদানিকে উৎসাহিত করে। ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে সরকার সর্বপ্রথম বেসরকারি উদ্যোগে খাদ্য আমদানির অনুমতি প্রদান করে যা প্রাথমিকভাবে আমদানি শুল্ক মুক্ত ছিল। এর ফলে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে ৩ লাখ টনের বেশি গম আমদানি করা হয়। যেহেতু পরিবহন খরচ বাবদ প্রতি টন খাদ্যশস্য আমদানি করার জন্য সরকারের ৫০ ডলার খরচ হত, তাই এই পরিমাণ খাদ্যশস্য বেসরকারিভাবে আমদানি হওয়ায় শুধুমাত্র এই খাতেই বার্ষিক ১.৫ কোটি ডলার সরকারি ব্যয় হ্রাস পায়। সার্বিকভাবে এসকল সংস্কারের ফলে খাদ্য বাজারে সরকারের ভূমিকা অনেকটা কমে আসে এবং এর ফলে ১৯৯২ সালের পর থেকে বার্ষিক ৭.৫ কোটি ডলার সরকারি ব্যয় হ্রাস পায়। এই সঞ্চয়কৃত অর্থ কাজে লাগানোর জন্য সরকার ১৯৯৩ এর আগস্ট মাসে একটি নতুন কর্মসূচি হাতে নেয় যা "শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য" (Food for Education) নামে পরিচিত। এই কর্মসূচিটির উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক শিক্ষালাভে উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাদের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান করা। প্রাথমিকভাবে এই কর্মসূচিটি সম্পূর্ণভাবে সরকারি উদ্যোগে চললেও পরবর্তীতে বিভিন্ন দাতা সংস্থা এই কর্মসূচিটির সহায়তায় এগিয়ে আসে। "শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচিটি ছিল রেশন-পরবর্তী সময়কালে সরকারের খাদ্যনীতির অন্যতম প্রধান সংস্কার পদক্ষেপ (Chowdhury and Haggblade 2000)।

সরকারের বিভিন্ন ধরনের সংস্কার পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদটি সংঘটিত হয় মিলারদের পক্ষ থেকে। ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে সরকারিভাবে চাল সংগ্রহ হ্রাসকরণ ও মিলগেট

চুক্তি বাতিলের বিরুদ্ধে মিলাররা সংগঠিতভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[১৯] মিলারদের দাবী ছিল সরকারি সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধি করা যার ফলে কৃষকেরা উপকৃত হবে। গণমাধ্যমেও বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রকৃতপক্ষে কৃষকরা মিলারদের কাছ থেকে সরকারি সংগ্রহমূল্য আদায়ে সক্ষম হয় না। মিলাররা কৃষকদের থেকে বাজার মূল্যেই ধান সংগ্রহ করে এবং সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত উচ্চমূল্যকে অতিরিক্ত মুনাফা তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে (Chowdhury 1992, IFPRI 1992, Shahabuddin and Islam, 1999)।

সংস্কারের বিপক্ষে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কখনোই প্রকাশ্য অবস্থান নিতে দেখা যায়নি। খাদ্য অধিদপ্তরের অনেক কর্মকর্তাই হয়ত সৎ কিন্তু উলেণ্ঢখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী যে খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংশিণ্ঢষ্ট দুর্নীতির সাথে জড়িত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। PFDS-এর সংস্কার, বিশেষভাবে রেশন ব্যবস্থায় অবলুপ্তি তাদের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় করেছিল। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল দেড় কোটি রেশনভোক্তাদের তরফ থেকে তেমন কোনো প্রতিবাদ না হওয়া। এ বিষয়ে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা ছিল মিশর, লাইবেরিয়া, তিউনেশিয়া প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতার তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারকে এরূপ সংস্কারের ফলে ভোক্তাদের দিক থেকে প্রচণ্ড রকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, অনেক সময় চাপের মুখে সরকারকে সংস্কার বাতিল করতে দেখা গেছে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের পতন ঘটেছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে খাদ্য ভর্তুকির পরিমাণ হ্রাসকরণ এবং একই সাথে বাজার দরের পতনের ফলে ভোক্তারা তেমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়নি বা তাদের স্বার্থ তেমন ভাবে ক্ষুন্ন হয়নি (Chowdhury and Haggblade 2000)।

১৯৯০-এর শুরু থেকে বাংলাদেশে খাদ্যনীতি পরিবর্তন ও সংস্কারের যে ধারা চলে আসছে তা একটি অত্যন্ড় জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন শক্তিশালী গোষ্ঠী যাদের স্বার্থ রেশন ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিল তাদের ভূমিকা রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রবন্ধে বিশেণ্ঢষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন কূটকৌশলের মাধ্যমে বিশেষ গোষ্ঠী স্বভাবতই সংস্কার বাতিল করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে পাঠকের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে এ সকল সংস্কারের ফলাফল কি এবং এ ব্যাপারে অতীত অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে খাদ্যনীতি সংস্কারের জন্য কি দিকনির্দেশনা প্রদান করে? এছাড়াও Chowdhury and Haggblade (2000) প্রায় এক দশক পূর্বে খাদ্য নীতি পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি ও রাজনীতি বিশেণ্ঢষণের জন্য যে প্রয়াস নিয়েছিলেন তা কি পরিবর্তিত বর্তমান পরিস্থিতিতেও প্রযোজ্য? এসকল প্রশ্নের সন্ড়োষজনক উত্তরের জন্য বিশেণ্ঢষণধর্মী আরও গবেষণার প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি

[১৯] The North Bengal Rice Millers Association-এর সদস্যবৃন্দ দিনাজপুরে রাস্ড়া অবরোধ করে এবং বগুড়া, নেত্রকোনা ও পিরোজপুর এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা উত্তরবঙ্গের ২৫,০০০ রাইস মিল বন্ধেরও হুমকী দেয়। উপরন্তু এই মিলাররা বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে চাল সংগ্রহ কর্মসূচি সম্প্রসারণের পক্ষে তীব্র প্রচারণা চালায়। এতেও তারা ক্ষান্ড় হয়নি। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় কৃষক বাচাও সংগঠন (Save the Farmers Committee) গড়ে তোলা হয় যা রাজনৈতিক সুবিধাবাদের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ (দৈনিক ইত্তেফাক, সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৯৩)।

Abdullah, A. A. and Q. Shahabuddin (1987): "Critical Issues in Agriculture: Policy Response and Unfinished Agenda," in *The Bangladesh Economy in Transition* edited by M.G. Quibria, published for the Asian Development Bank, Oxford University Press.

Ahmed, et al. (2010): *Income Growth, Safety Nets and Public Food Distribution*, Report prepared for Bangladesh Food Security Investment Forum 2010, held in Dhaka on 26-27 May, 2010.

Ahmed, R. et. al., (2000): *Out of the Shadow of Famine: Evolving Food Markets and Food Policy in Bangladesh* edited by Raisuddin Ahmed, Steven Haggblade and Towfique-e-Elahi Chowdhury, published for International Food Policy Research Institute, Johns Hopkins University Press, Baltimore, U.S.A.

Ahmed, A.U. (1993): "Operational Performance of the Rural Rationing Program in Bangladesh." Bangladesh Food Policy Project Working Paper 5, Washington D.C.: International Food Policy Research Institute.

Ahmed, N. et. al., (2009): Chapter on Bangladesh in Distortions to Agricultural Incentives in Asia, edited by Kym Anderson and Will Martin, The World Bank, Washington D.C.

Ali, A.M.M. Shawkat et al. (2008): Chapter 5 on Public Food Distribution System in Bangladesh in From Parastatals to Private Trade: Lessons from Asian Agriculture edited by Shahidur Rashid, Ashok Gulati and Ralph Cummings Jr., Oxford University Press, New Delhi.

Chowdhury, T. E. and S. Haggblade (2000): Chapter 9 on Dynamics and Politics of Policy Change in *Out of the Shadow of Famine: Evolving Food Markets and Food Policy in Bangladesh* edited by Ahmed, R. et. al., published for International Food Policy Research Institute, Johns Hopkins Univesity Press, Baltimore, U.S.A.

Dorosh, P., Q. Shahabuddin and N. Farid (2004): "Price Stabilization and Food Stock Policy" in *The 1998 Floods and Beyond: Towards Comprehensive Food Security in Bangladesh* edited by Dorosh, P. et. al., published for International Food Policy Research Institute, The University Press Limited, Dhaka.

Grindle, M.S. (1991): "The New Political Economy: Positive Economics and Negative Politics," in G.M. Meier, (ed,) *Politics and Policy Making in Developing Countries*, San Francisco: ICS Press.

International Food Policy Research Institute (IFPRI) (1992): Open Tendering for Rice, Bangladesh Food Policy Project Brief 1, Dhaka: International Food Policy Research Institute.

Murshid, K.A.S. et. al. (2009): *Re-emergence of Food Security in Bangladesh: Instability in Food Production and Prices, Nature of Food Markets, Impact and Policy*, Report prepared for National Food Policy Capacity Strengthening Programme (NFPCSP), Ministry of Food, Govt. of Bangladesh.

Pinstrup-Anderson, Per (1993): *The Political Economy of Food and Nutrition Policies*, edited by Per Pinstrup-Anderson, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, U.S.A.

Shahabuddin, Q. and K.M.N. Islam (1999): "Domestic Rice Procurement Programme in Bangladesh: An Evaluation," Food Management Research Support Project Working Paper No. 8, Washington, D.C. and Dhaka: International Food Policy Research Institute and Food Management Research Support Project.

Working Group on Targeted Food Interventions (WGTFI), (1994): *Options for Targeting Food Interventions in Bangladesh*, Washington D.C., International Food Policy Research Institute.